একই প্রকারের কাজ নয়। এ প্রসঙ্গে একটি প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য : It is quite possible that the counter-offensive so far employed may not have been quite effective or produced the desired results, within a given time frame. It is also possible that the counter measures as conceived so far have not been quite relevant to the challenges at hand. The response has been either grossly inadequate (as in the case of India in the Kashmir imbroglio) or grossly over-reactive (as in the case of US-led western expedition in Afghanistan).

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস (State Terrorism)

অস্বীকার করার উপায় নেই যে নাগাড়ে সন্ত্রাস ঘটতে থাকলে রাষ্ট্রকে তৎপর হতেই হয় এবং একেবারে হাল ছেড়ে দেওয়ার অবস্থায় উপনীত না হওয়া পর্যন্ত সর্বশক্তি দিয়ে সন্ত্রাসের প্রতিরোধ চালিয়েই যেতে হয়। আবার এই কাজে অসংযত বা বেপরোয়া বলপ্রয়োগ ঘটতে থাকলে, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সরকার আন্তর্জাতিক সমালোচনা ও নিন্দার পাত্র হয়ে পড়ে। কোনো কোনো রাষ্ট্র দেশের অখণ্ডতা বজায় রাখার নামে এবং নাগরিক জীবনে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কঠোর আইন-শৃঙ্খলার মাধ্যমে এবং সরকারি দমনপীড়ন যন্ত্রকে ইচ্ছামতো ব্যবহার করে সম্ভাব্য সন্ত্রাসকে ঠেকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। দুই ক্ষেত্রেই গুরুতর একটি অভিযোগ ওঠে, যার প্রচলিত নাম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস।

এই 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস' কথাটির মধ্যে এক রকমের আপাত-বিরোধ রয়েছে। রাষ্ট্রকে তত্ত্বগতভাবে জনসমষ্টির পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদানের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই কারণে রাষ্ট্রের হাতে সামরিক ও আধাসামরিক শক্তিরও একচেটিয়া মালিকানা। দেশের শান্তি ও সুস্থিতি বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে রাষ্ট্রকেই কঠোর হাতে তা দমন করতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় কখনও কখনও সন্দেহভাজন অথচ নিরীহ মানুষের ওপরেও হামলা ঘটতে পারে এবং দেশের সংবিধান অনুযায়ী এ ব্যাপারে দায়ী সরকারকে বিচারবিভাগের কাছে জবাবদিহি করতে হতে পারে। আবার দেশকে সন্ত্রাসমুক্ত করার জন্য—সরকারকে আলাদা করে কোনো বাহবাও দেওয়া হয় না। কারণ এটাই তার কাজ; করতে না পারাই ব্যর্থতা। যাই হোক, সাফল্য বা ব্যর্থতার বিচারের ব্যাপারটি জাতি-সমাজের মধ্যেই থাকে। এজন্য আন্তর্জাতিক মহলে রাষ্ট্রের সমালোচনা হলেও রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক আইনে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। কারণ এটা রাষ্ট্রের নিজস্ব ঘরোয়া অধিকার (domestic jurisdiction)-ভুক্ত ব্যাপার। অর্থাৎ রাষ্ট্রের সঙ্গে পুরসমাজের এটা একজাতীয় উত্তেজনা বা tension হিসেবেই দেখা হয়ে এসেছে এবং সেখানেই এর প্রশমন ঘটার কথা।

এই সাবেকি দৃষ্টিভঙ্গি ইদানীং সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হচ্ছে না। সন্ত্রাস দমনের নামে জনসাধারণের কিংবা তার একাংশের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় উৎপীড়নের অভিযোগ উঠছে। 'State against the people' অর্থাৎ রাষ্ট্র তার নিজের এলাকাভুক্ত মানুষের চোখে বৈরী প্রতিপন্ন হচ্ছে। এক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আলোচনার প্রেক্ষিতটিই বদলে যায়। শাসক-বিরোধী সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ তখন আত্মরক্ষার অধিকার হিসেবে মেনে নিতে হয়; মর্যাদা দিতে হয় সন্ত্রাসকারী বলে অভিযুক্ত বিদ্রোহীদের স্বাভাবিক অধিকার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে। বন্দি অবস্থায় বিচারাধীন অন্য সব বন্দির প্রাপ্য সব সুযোগসুবিধাও দিতে হয়। এমনকি জেরার প্রয়োজনে তাদের ওপর কোনো নির্যাতন ঘটলে সেটি নিন্দনীয় বলে গণ্য হয় এবং প্রতিবিধানের দাবি ওঠে।

রাষ্ট্রকে এইরকম সন্ত্রাসবাদী ভূমিকায় দেখার প্রতিচ্ছায়া আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনার ওপরেও এসে পড়েছে। সার্বভৌম ক্ষমতা ও ঘরোয়া অধিকারের কথা যতই বলা হোক না, রাষ্ট্র এখন এমন এক আন্তর্জাতিক সমাজের অন্তর্ভুক্ত, যেখানে ক্রমশই ব্যক্তিমানুষ ও তাদের স্বাধীনভাবে সংগঠিত গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রচলিত সম্পর্কের ওপরে সততই নজর রাখা হচ্ছে। জনমত ও আইন ক্রমশই একত্র হচ্ছে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা প্রয়োগের অন্যায় আতিশয্যকে খর্ব করার জন্য। আন্তর্জাতিক বিধি-বিধানে মানবাধিকার এখন একটি স্বীকৃত ও স্বতন্ত্র বিষয়। কোনো রাষ্ট্রে নির্বিচারে মানবাধিকার লঙ্ঘন এখন আর উপেক্ষিত হওয়ার উপায় নেই। Amnesty International-এর সতর্ক নজর পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এবং গুরুতর অভিযোগ থাকলে মানবাধিকার কমিশনসহ বিশ্বসংগঠন সমূহে সে বিষয়ে জোর সওয়াল চলে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিবিধানমূলক আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপও ঘটে থাকে।[৩৬]

রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নানা আকারে প্রকাশ পেতে পারে। প্রথমত, জাতীয় সমাজে অধিকারের আন্দোলন দমনে। পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক আদর্শ এখন বহুল পরিমাণে স্বীকৃতি লাভ করলেও গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুত স্বাধীনতার অধিকারগুলি ভোগ করার সুযোগ সবদেশে সমান নয়। সংবিধানে কিছু কিছু অধিকার দেওয়া হলেও অনেক অধিকারই এখনও নাগালের বাইরে; আবার প্রদত্ত অধিকারের ওপর অনেক রকমের বাধা-নিষেধ আরোপিত। স্বভাবতই, অধিকারের স্বাদ পাওয়া মানুষের আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা যতই বাড়ে অধিকার আদায়ের আন্দোলন ততই জোরদার হয়ে ওঠে। ক্ষমতাসীন সরকারও কায়েমি স্বার্থের প্রতিভূ হওয়ায় এই আন্দোলন দমনে সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং ব্যাপক ধর-পাকড় ও উৎপীড়ন চলতে থাকে। এশিয়ায় পাকিস্তান-ফিলিপিন্স-মায়ানমার; দক্ষিণ আমেরিকায় গুয়াতেমালা-নিকারাগুয়া; আফ্রিকায় উগান্ডা-কঙ্গো-(প্রাক্তন জায়েরে)-নাইজেরিয়া গণ-আন্দোলন দমনের ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে

অত্যাচারের নজির সৃষ্টি করে। স্মরণকালের মধ্যে দমনপীড়ন নৃশংসতম চেহারা নেয় পল্‌পট শাসিত কাম্বোডিয়ায় (১৯৭৩-৯০)। প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নে স্তালিন আমলে ও পরে ব্রেজনেভ আমলে অধিকার-সচেতন সমস্ত বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে স্বৈরাচারী দমন এখন সুবিদিত।

দ্বিতীয়ত, দেশের মধ্যে অথবা দেশের বাইরে সংগঠিত বৈপ্লবিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে, সাম্প্রতিক কালে ইয়োরোপের সার্বিয়ায় মিলোসেভিচ শাসনকালে কোসোভো এলাকায়, আশির দশক থেকে আফ্রিকার বুরুন্ডিতে হুটু-টুট্‌সি গৃহযুদ্ধে, ইরাকে কুর্দ উপজাতি বিদ্রোহে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস প্রত্যক্ষ করা গেছে।

তৃতীয়ত, দেশের মধ্যে অথবা বাইরে থেকে সংগঠিত বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে, শ্রীলঙ্কায় LTTE-র পক্ষে, কাশ্মীরে নানা নামে সংগঠিত সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষে, ইন্দোনেশিয়ায় পূর্ব-টিমোরের স্বাধীনতা আন্দোলন Fretilin-এর পক্ষে; উত্তর আয়র্ল্যান্ডে সিন্‌ফেইনের পক্ষে, এবং রাশিয়ায় চেচেন বিদ্রোহীদের পক্ষে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের।

চতুর্থত, এক রাষ্ট্র কর্তৃক পার্শ্ববর্তী কোনো রাষ্ট্রে গোপনে সন্ত্রাস চালান দেওয়া ইদানীং এক বহুশ্রুত অভিযোগ। অবশ্য চেষ্টা করেও এই অপকর্ম গোপন রাখা যায় না। কাশ্মীরে অবস্থানকারী উগ্রপন্থী সংগঠনগুলির নিরীহ কাশ্মীরী মানুষের ওপর বেপরোয়া আক্রমণ কিংবা ইজরেয়লী জিওনিস্ট গোষ্ঠী (Sterngang, Irgun) ইত্যাদির প্যালেস্তিনীয় এলাকায় নিয়মিত হানাদারির মূলে প্রতিবেশী দেশ যথাক্রমে পাকিস্তান এবং ইজরেয়লের প্রত্যক্ষ মদত আন্তঃরাষ্ট্র সন্ত্রাস চালানোর জাগ্রত উদাহরণ। এই ধরনের সন্ত্রাস চালানো যদি নীচু পর্দার আক্রমণ হয়, তাহলে উঁচু পর্দার প্রত্যক্ষ সন্ত্রাসের উদাহরণ পাওয়া যাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু বলদর্পী ক্রিয়াকলাপে। বিশ্বের নানাস্থানে অত্যাচারী স্বৈরশাসকদের সমর্থন ও সাহায্য প্রদান (১৯৫০-এর দশকে পর্তুগালের সালাজার শাসন থেকে শুরু করে ১৯৭০-৮০-র দশক জুড়ে চিলির পিনোচে পর্যন্ত), অন্য দেশের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতমূলক কাজে সক্রিয় উৎসাহদান (কিউবার বিপ্লবী সরকার উৎখাতের আশায় প্রেসিডেন্ট কেনেডির আমলে বে'অব পিগ্‌স অভিযান ১৯৬১), বার্লিনে একটি প্রমোদশালায় বিস্ফোরণের ফলে মার্কিন সেনাদের নিহত হওয়ার পর মার্কিন বিমান থেকে লিবিয়ার ভূখণ্ডে প্রতিশোধমূলক বোমাবর্ষণ (রেগ্যান আমলে ১৯৮৬), নিকারাগুয়ায় মাদক চালানকারী আতঙ্কবাদীদের উৎখাত করার নামে অসামরিক লক্ষ্যবস্তুর ওপর দেদার আক্রমণ (যা পরে বিশ্বআদালত কর্তৃক নিন্দিত হয়েছে ক্ষতিপূরণের আদেশসহ) এবং সর্বশেষ আফগানিস্তান ও ইরাকে অল্‌-কাঈদাকে নির্মূল করার জেদের বশে নিরন্তর ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাওয়া। এর প্রত্যেকটিই যাবতীয় আন্তর্জাতিক আচরণবিধির

প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনই নয়, ক্রমবর্ধমান এক অনিয়ন্ত্রিত প্রতি-সন্ত্রাসের জঙ্গিপনা (counter terrorist militancy) যা সমস্ত অর্থেই অমানবিক। প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত কোনো এক আঘাতের প্রত্যাঘাত যদি সীমাহীন হিংসার পরিচায়ক হয় তাহলে প্রশ্ন উঠতেই পারে : এর ফলে যে শত-সহস্র অহিংস মানুষকে প্রতিহিংসার বলি হতে হল তাকে নিশ্চয়ই ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার ক্ষতি (colateral damage) বলে ধরা যাবে না। আর সন্ত্রাস ঘটেছে বলেই ক্ষতিগ্রস্ত কোনো দেশ অন্য দেশে যথেচ্ছ হামলা চালিয়ে 'দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার' অধিকার দাবি করতে পারে না। কিন্তু আমেরিকা এটাকেই দস্তুর বলে চালাতে উঠে পড়ে লেগেছে। কারণ, তাদের একটাই যুক্তি, যা নোম্‌ চম্‌স্কি-র ব্যঙ্গ মিশ্রিত ভাষায়—"terrorism is terrorism against us, excluding what we do to them." (আমাদের অর্থাৎ আমেরিকানদের ওপর আঘাত এলে সেটা সন্ত্রাসবাদ, আর আমেরিকার দিক থেকে যাই করা হোক না কেন সেটা ধর্তব্য নয়)।[৩৭]

আন্তঃরাষ্ট্র সন্ত্রাসের অন্য আর একটি দিক হল নিজের আশু স্বার্থসাধন কিংবা সংকট মোচনের জন্য সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে অশুভ আঁতাত করা। আমেরিকায় রেগ্যান আমলে Iran-contra সংক্রান্ত কেলেঙ্কারি—(যেখানে কিছু পণবন্দি মার্কিন নাগরিকদের মুক্তিপণ দিতে ইরানে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর হাতে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র চালান হয়) কিংবা আফগানিস্তানে রুশ সামরিক সাহায্যপুষ্ট বিপ্লবীদের রুখতে মৌলবাদী তালিবানদের সংগঠিত করা ও দেদার অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা (পাকিস্তান একাজে সহজ সহকারী হিসেবে ব্যবহৃত) এই রকম অপকৌশলের উদাহরণ। পরিণামে এইসব গোষ্ঠীই দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতা সৃষ্টিতে অত্যন্ত বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তাদের ঠেকাতেই আবার মার্কিন সামরিক শক্তির পুনর্ব্যবহার। এসব ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের দায় উভয় পক্ষেই বর্তায়।

এই পরিস্থিতির সামনে দাঁড়িয়ে সন্ত্রাসবাদের চরিত্র নির্ধারণ অন্যভাবে করার প্রয়াস চলছে। ভাবা হচ্ছে, উন্নত দুনিয়া ও তার সাগরেদ শক্তিগুলির বিরুদ্ধে উন্নয়নবঞ্চিত দুনিয়ার প্রতিস্পর্ধিতা (challenge) এবার সন্ত্রাসের মধ্যেই তার বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে। তৃতীয় দুনিয়া যেখানে সাম্রাজ্যবাদের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের আদিম চেহারা ফুটে উঠেছিল, সেখানে কোনো কোনো রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মধ্যে এই প্রত্যয় এখন দৃঢ় হচ্ছে যে সন্ত্রাসবাদকে রুখতে হলে সাম্রাজ্যবাদকেও রুখতে হবে।

আবার সন্ত্রস্ত রাষ্ট্রগুলিতে মৌলবাদী ইসলামকেই বিপদের প্রধান উৎস বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। এই মৌলবাদ সেইসব দেশেই দানা বাঁধছে যেখানে রয়েছে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক হরেক রকমের অসন্তোষ, সাম্প্রদায়িক জিগির, সামাজিক অনগ্রসরতা,

সামরিক শাসনের বাড়াবাড়ি এমনকি অবৈধ পণ্যের ও অস্ত্রের ঢালাও কারবার— এইসব কিছুর সমাবেশে তৈরি হচ্ছে এক অস্বাভাবিক বাতাবরণ যা সন্ত্রাসবাদীদের নিঃশব্দে যখন যেখানে খুশি কাজ হাসিল করার সুযোগ এনে দিচ্ছে। অর্থাৎ আলাদা বা এককভাবে শুধু অল্-কাঈদা নয়, আজকের সন্ত্রাস জন্ম নিয়েছে বর্তমান বিশ্ব-ব্যবস্থার মধ্যেই যার পূর্ণ সুযোগ যে-কোনো ধ্বংসকামী সংগঠনই নিতে পারে। সেইসব সাংগঠনকে আশ্রয় দেওয়া বা প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে রাষ্ট্র সমর্থিত সন্ত্রাসের (state sponsored terrorism)।

সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রণ ও নিরোধে আন্তর্জাতিক বিধিব্যবস্থা

আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের দিক থেকে বিচার করলে রাষ্ট্রের নির্দেশে বা মদতে সংগঠিত যে-কোনো সন্ত্রাসই অপরাধ বলে গণ্য হবে। বিশেষত সেই সন্ত্রাসের লক্ষ্যবস্তু যদি হয় অন্য একটি রাষ্ট্র। ঐ আইনে রাষ্ট্রের দায়দায়িত্ব সংক্রান্ত যেসব বিধি-বিধান রয়েছে সেগুলি অনেকাংশেই আন্তর্জাতিক চুক্তি বা সমঝোতা দ্বারা সমর্থিত। এইসব বিধানের সাধারণ ও আদিম অবলম্বন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ২(৪) সংখ্যক ধারাটি যাতে রাষ্ট্র কর্তৃক সমস্ত প্রকার বলপ্রয়োগ অথবা ভীতিপ্রদর্শন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

আবার, ঐ সংগঠনের সাধারণ পরিষদ (General Assembly) কর্তৃক গৃহীত আগ্রাসনের সংজ্ঞায় স্পষ্ট করে বলা আছে ঃ "an armed attack must be understood as including not merely action by regular armed forces across an international border but also the sending by or on behalf of a state of armed bands groups of irregulars or mercenaries which carry out acts of armed force against another state of such gravity as to amount to an actual armed attack."[৩৮]

অর্থাৎ শুধু নিয়মিত সৈন্যবাহিনী দিয়ে নয়, আন্তর্জাতিক সীমা অতিক্রম করে পাঠানো সশস্ত্র হানাদার বা ভাড়াটে সৈন্য দিয়ে আক্রমণ করাও আগ্রাসনের পর্যায়ে পড়ে। এই ব্যাপারটি নিকারাগুয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধা সামরিক বাহিনী প্রেরণের মামলায় আন্তর্জাতিক আদালতের সুস্পষ্ট রায়ে (১৯৮৬) আরও সপ্রমাণ হয়েছে।

নিরীহ নাগরিকদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করার কথা বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের Rome statute-এ (acts of terror as murder, or even persecution directed against only civilian population)।

বস্তুত, ১৯৭০-এর দশক থেকেই আন্তর্জাতিক সংগঠনে সন্ত্রাসবাদ নিবারণের জন্য চেষ্টা শুরু হয়। প্রায় দু-বছর অন্তরই দেখা গেছে UNO-তে সন্ত্রাস বিরোধী কোনো না কোনো প্রস্তাব আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ১৯৯৪ সালে সাধারণ পরিষদ এ ব্যাপারে সন্ত্রাসের সর্বপ্রকার প্রকাশের নিন্দা করে প্রস্তাব নেয় ঃ "The General Assembly unequivocally condemned all acts of terrorism, as criminal and unjustifiable wherever and by whomsoever committed..."

ঐ প্রস্তাবেরই কার্যকরী বিধানগুলির পঞ্চম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রকেই সন্ত্রাসবাদ দমনের কাজটি সনদ ও আন্তর্জাতিক আইন মোতাবেক বাধ্যবাধকতা হিসেবে দেখতে হবে এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের দ্রুত অপসারণে তৎপর হতে হবে। এই সংক্রান্ত পদক্ষেপগুলি হল ঃ

ক. সমস্ত প্রকার সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপের সংগঠন, উস্কানি, সাহায্যদান, অর্থ-সরবরাহ, উৎসাহদান এমনকি সহ্য করে যাওয়া থেকে বিরত হওয়া;

খ. নিজ নিজ ভূখণ্ডকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য ব্যবহৃত হতে না দেওয়া;

গ. সন্ত্রাসমূলক কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার, বিচার, শাস্তিদান এবং (বিদেশির ক্ষেত্রে) প্রত্যর্পণ;

ঘ. এই মর্মে রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে অথবা আঞ্চলিক স্তরে বিশেষ চুক্তি সম্পাদন।

ঙ. আন্তর্জাতিক স্তরে সন্ত্রাসদমনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ও বিনিময়ের কাজে রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে সহযোগিতা;

চ. বিদ্যমান আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলির জাতীয় আইনের মাধ্যমে প্রয়োগের ব্যাপারে সহমত;

ছ. সন্ত্রাসবাদী সংশ্রব আছে এমন কোনো ব্যক্তি আশ্রয়প্রার্থী হলে রাষ্ট্রীয় আশ্রয় (asylum) না দেওয়া এবং উদ্বাস্তুদের আশ্রয় না দেওয়া।

এরপর ২০০০ সালে অনুষ্ঠিত সহস্রাব্দ শীর্ষ বৈঠক (UN Millennium Summit)-এর চূড়ান্ত ঘোষণা সমস্ত রকম সন্ত্রাসের দমন ও বিনাশকে জরুরি ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে। আমেরিকায় ১১ সেপ্টেম্বর-এর দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে বিশেষ অধিবেশন বসে এবং সন্ত্রাসদমনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ঐ বৈঠকেই আরও বিশেষ করে জোর দেওয়া হয় মাদকদ্রব্য ও ছোটো অস্ত্রের নিষিদ্ধ চোরাচালানের সঙ্গে সন্ত্রাসের বিশেষ সংযোগের ওপর। এই প্রসঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত ১৩৭৩ সংখ্যক সিদ্ধান্তটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (২৮ সেপ্টেম্বর, ২০০১) সন্ত্রাসের কোনো সংজ্ঞা এতে দেওয়া হয়নি কিন্তু সন্ত্রাসে জড়িত হতে পারে এমন সবরকমের গোষ্ঠী

বা সংস্থাকে নজরদারি ও শাস্তিদানের আওতায় আনা হয়েছে এবং সদস্য সব রাষ্ট্রকে বলা হয়েছে অপরাধীর শনাক্তকরণ, গ্রেপ্তার, অনুসন্ধান ও ধৃতবন্দির বিচার বাধ্যতামূলক করার আইন প্রণয়ন করতে।

সন্ত্রাসদমনে কতকগুলি আঞ্চলিক উদ্যোগ

দক্ষিণ এশিয়ায় মাদকচালান, নাশকতামূলক জঙ্গি ক্রিয়াকলাপ, সীমান্ত পেরোনো সন্ত্রাস এখন এমন ব্যাপক আকার নিয়েছে যে এই অঞ্চলের রাষ্ট্রনেতারা আঞ্চলিক মঞ্চ SAARC-এ বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং ১৯৮৭ সালে যৌথভাবে সন্ত্রাসদমনে বিশেষ কতকগুলি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।[৩৯] সেখানে সন্ত্রাসের সংজ্ঞা এমনভাবে দেওয়া হয়েছে যাতে করে রাজনৈতিক অপরাধ-এর অজুহাত কোনোভাবেই খাটবে না। এই যুক্তির একটি বিশেষ বিধান বলে অন্য রাষ্ট্রের থেকে আগত সন্ত্রাসবাদীদের বিচার ও শাস্তিদানের অধিকার (extraterritorial jurisdiction) সদস্যরাষ্ট্রগুলি প্রয়োগ করতে পারে। পলাতক অপরাধীকে প্রত্যর্পণের দায়িত্ব প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই নিতে হবে। এই প্রত্যর্পণের ব্যাপারটি এখনও অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। স্মরণ করা যেতে পারে যে ভারতে নাশকতামূলক কাজ ও বিমান ছিনতাই-এ জড়িত ১২ জন অপরাধীকে প্রত্যর্পণ করা দূরে থাক পাকিস্তানে এখনও বহাল তবিয়তে রাখা হয়েছে।[৪০]

এছাড়া অন্যান্য অঞ্চলেও সন্ত্রাস নিবারণের উদ্দেশ্যে অঞ্চলভুক্ত রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এর কয়েকটি উদাহরণ ঃ

১. কায়রোয় আরব লিগের সচিবালয়ে গৃহীত Arab Convention on suppression of Terrorism ;
২. আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত আফ্রিকান রাষ্ট্র সম্মেলনে (OAU) গৃহীত Convention on the Prevention and Combating of Terrorism adopted on 14 July 1999;
৩. মিনস্কে CIS ভুক্ত প্রাক্তন সোভিয়েত অঙ্গরাজ্যগুলির চুক্তি Treaty on Cooperation among states Members of CIS;
৪. সাংহাই-এ অনুষ্ঠিত রাশিয়া ও চীনসহ মধ্যএশিয়া সংলগ্ন দেশগুলির যৌথ উদ্যোগ (Shanghai Cooperation Organization, June 2001);
৫. ASEAN Regional Forum-এ ASEAN ও USA-র মধ্যে সন্ত্রাসদমনে সহযোগিতা;
৬. ইয়োরোপের স্ট্রাসবুর্গে European Convention on the suppression of Terrorism (27 January, 1977);

৭. আমেরিকা মহাদেশীয় আঞ্চলিক সংগঠন OAU-র Convention to Prevent and Punish Acts of Terrorism (Washington, 2 February, 1971)।

এইসব আঞ্চলিক উদ্যোগের পক্ষে একথাই বলা হয় যে সন্ত্রাস এখন বিশ্বের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়লেও, তাদের বিশেষ কতকগুলি লক্ষ্যস্থল (target) যখন কোনো বিশেষ দেশের প্রতি নিবদ্ধ থাকে, তখন সন্ত্রাসবাদীরা আশপাশের এলাকা থেকে আক্রমণ চালানো এবং সন্ত্রাস-কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও রসদ সরবরাহ করার সুবিধা থাকলে, মোটর ব্যবহারে পিছ-পা হয় না। বিশেষ করে ঐ অঞ্চলের মধ্যেই যদি দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রে বৈরিতা থাকে, তাহলে অন্যের ক্ষতিসাধনের জন্য বকলমে শত্রুতা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেওয়া হয় সন্ত্রাসকে সাহায্য দিয়ে। তাছাড়া শত্রুতা না থাকলেও পলায়নপর সন্ত্রাসবাদীরা আত্মগোপন করার জায়গা হিসেবেও বেছে নেয় আশপাশের এলাকা। ভারতবর্ষের বিচ্ছিন্নতাকামী জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি এভাবেই বাংলাদেশ, ভুটান ও পাকিস্তানে ডেরা বেঁধেছে। সেজন্য আঞ্চলিক স্তরে যৌথ প্রয়াস না থাকলে সন্ত্রাস পুরোপুরি নির্মূল হতে পারে না।

অঞ্চল-নিবদ্ধতা ছাড়াও সন্ত্রাসের কতকগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয় কার্যপ্রণালী আছে। যেমন বিমানদস্যুতা, অপহরণ, বন্দিপণ দাবি, সমুদ্র ও স্থলপথে মাইন স্থাপন ইত্যাদি। এগুলির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ইতিমধ্যেই অনেকগুলি সাধারণ চুক্তি বলবৎ রয়েছে। যেমন, আকাশপথে হামলার ব্যাপারে পরপর স্বাক্ষরিত হয়েছে টোকিও (১৯৬৩), হেগ (১৯৭০) ও মন্ট্রিয়ল (১৯৭১) চুক্তি। অপহরণ ও বন্দিপণ বিরোধী চুক্তিটি সম্পাদিত হয় ১৯৭৯-র Convention Against Taking of Hostages। তাছাড়া নৌ-চলাচলের নিরাপত্তা বিধানের জন্য রয়েছে Safety of Maritime Navigations চুক্তি (১৯৮৮)।

এছাড়া বর্তমান জগতে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের বিস্ময়কর অগ্রগতি সন্ত্রাস সঞ্চারে যেমন সন্ত্রাসদমনেও তেমনই সহায়তা করছে।[৪১] আবার বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজারের প্রসারণে অর্থনৈতিক লেনদেনেও অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ ঘটে চলেছে। এজন্য সম্পাদিত হয়েছে Convention for Suppression of Financing of Terrorism (1999) আর সেই সঙ্গে দেখা দিয়েছে নানা ধরনের গণকযন্ত্রীয় দুর্বৃত্তপনা (Cyber-Crime)। আশঙ্কা জেগেছে জৈব সন্ত্রাসের (bio-terrorism) এসবের মোকাবিলা করার জন্য বিশেষ ধরনের প্রযুক্তি সমৃদ্ধ নাশকতা দমনের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

প্রসঙ্গত ভারত সরকার এইসব চুক্তির অনেকগুলিরই শরিক, সমর্থক ও উদ্যোক্তা। সন্ত্রাসদমনের প্রয়োজনেই ভারত সরকার POTA (Prevention of Terrorist

সন্ত্রাসবাদ (Terrorism)

মানবসভ্যতার বর্তমান কালপর্ব একদিকে যেমন আশাতীত উন্নয়ন এবং জাতিতে-জাতিতে সংঘর্ষের পাশাপাশি সহযোগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে চলেছে, অন্যদিকে আবার মানুষেরই সৃষ্ট নাশকতায় সৃষ্টি হচ্ছে আতঙ্কের এক স্থায়ী বাতাবরণ। সন্ত্রাসবাদের মারাত্মক আঘাতে বিপর্যস্ত হচ্ছে একাধিক জনসমাজ। কোথাও কোথাও বিস্তীর্ণ এলাকা এখন উপদ্রুত বলে চিহ্নিত। অথচ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানের পর আশা করা গিয়েছিল সংঘাতের স্থান নেবে শান্তি ও সুস্থিতি। তার বদলে সন্ত্রাস এখন আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় উভয় স্তরেই একটি জটিল সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

সন্ত্রাস ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা

সন্ত্রাস নানা দিক থেকে বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে বিচলিত করে তুলেছে।

১. নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে সংগঠিত জাতি-রাষ্ট্রের বিদ্যমান কাঠামোকে ভঙ্গুর প্রমাণ করা এবং জাতীয় শাসনব্যবস্থার প্রচলিত বিধানের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা। এর নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অনিশ্চয়তা এবং অস্থিরতায় আক্রান্ত রইবে দুনিয়ার বেশ কয়েকটি এলাকা। তাদের স্বাভাবিক বিদেশনীতিও সেই অনুপাতে বিঘ্নিত হবে।

২. আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ক্ষমতাবান রাষ্ট্রগুলি প্রভাবের ক্ষেত্র (spheres of influence) নির্মাণে যতটা নিরাপদ সাফল্য আশা করে এসেছে, সন্ত্রাসবাদের অভ্যুত্থানে তা আর নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবার নয়।

৩. আঞ্চলিক সমস্যাগুলি যখন আন্তর্জাতিক স্তরে কোনো সুষ্ঠু মীমাংসা পায় না, তখন সন্ত্রাস তাতে অন্য এক মাত্রা সংযোজন করে। হয় সেগুলির স্থানীয়ভাবে সমাধান করিয়ে নেওয়া, নয় আন্তর্জাতিক প্রয়াসকে সফল করার জন্য বাইরে থেকে আসা ব্যাপকতর জুলুম সহ্য করা। নচেৎ অভ্যুত্থান, দমন এবং আবার অভ্যুত্থান এইভাবে চক্রাকারে অশান্তি চলতেই থাকে।

৪. সন্ত্রাসবাদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভরকেন্দ্র যতই টলে উঠবে, বৃহৎ শক্তিগুলি ততই পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসতে থাকবে। তাদের পারস্পরিক দ্বেষ এবং বিবাদকে উপেক্ষা করে সমবেত প্রয়াসে সন্ত্রাসকে প্রতিহত করার কাজটিকে তারা অগ্রাধিকার দেবে। অন্যভাবে দেখলে, বৃহৎ শক্তির আধিপত্যের পক্ষে একটা অতিরিক্ত সওয়াল করার অজুহাত এইভাবে তৈরি হয়ে যায় এবং আতঙ্কগ্রস্ত ক্ষুদ্র শক্তিগুলি স্বভাবতই বৃহৎ শক্তিসমূহের চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে তাদের কাছেই সমর্পিত হয় সুরক্ষার আশায়।

৫. বিশ্ব-রাজনীতিকে এখন আর বিশ্ব-অর্থনীতি থেকে আলাদা করে দেখার উপায় নেই। অর্থনৈতিক শক্তিই এখন ক্ষমতার মানদণ্ড এবং অর্থনৈতিক প্রভুত্বকেই নয়া সাম্রাজ্যবাদ হিসেবে গণ্য করা হয়। এই প্রেক্ষিতে, সন্ত্রাসজাত হানাহানি ক্রমপ্রকাশমান বিশ্ব-অর্থনীতির স্বাভাবিক ক্রিয়াকে ব্যাহত করে। মুনাফা অর্জনের যে হিসেব-নিকেশ অনুসরণ করে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের দিক নির্দিষ্ট হয়ে থাকে—কোনো বিশেষ এলাকায় সন্ত্রাসবাদী উৎপাত দীর্ঘস্থায়ী হলে অথবা কোনো কোনো বৃহৎ শক্তি বিশেষভাবে সন্ত্রাসবাদের লক্ষ্যস্থল বলে ঘোষিত হয়ে থাকলে, বিশ্ব অর্থনীতির স্রোত সেখান থেকে ঘুরে যেতে থাকবে যাতে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ব্যাপক ক্ষতি এড়ানো যায়।

৬. সন্ত্রাসবাদ কোনো একটি দেশ বা অঞ্চল থেকে যদি অন্য নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং বর্তমান যুগে সেটাই তার সমধিক গুরুত্বের অন্যতম কারণ—তাহলে সন্ত্রাসবাদকেও একটি স্বতন্ত্র আন্তর্জাতিক শক্তি হিসেবে গণ্য করতে হয়। বিদ্যমান সুস্থিতির বিরুদ্ধে যেহেতু তার আক্রমণ, সেইহেতু তাকে রুখতে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলি, বিশেষ করে UNO, তৎপর হতে বাধ্য। এখানে যৌথ নিরাপত্তার ধারণাটিই বদলে যাচ্ছে; কারণ কোনো একটি আগ্রাসী দেশের বিরুদ্ধে নয়, অনির্দিষ্ট এবং সঞ্চরণশীল এক অজানা শত্রুর বিরুদ্ধে সমবেত আঘাত হানার প্রস্তুতি চলবে। সেজন্য বেছে নেওয়া হবে সেইসব দেশকে যেগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়ার ব্যাপারে অভিযুক্ত। কিন্তু বৃহৎ শক্তির স্বার্থে এবং নির্দেশে পরিচালিত সন্ত্রাস নিবারক ব্যবস্থা সর্বত্র সমানভাবে প্রযুক্ত হতে পারে না। কারণ, দুনিয়ার যত্র-তত্র যখন তখন সন্ত্রাসদমনের ক্ষমতা যদি আন্তর্জাতিক সংগঠনের হাতে থাকত, তাহলে সে সংগঠন প্রায় বিশ্বরাষ্ট্রের সমতুল্য শক্তিধর একটি সত্তা হিসেবে পরিগণিত হত—যেমন হয়ে থাকে জাতি-রাষ্ট্রের ভিতরে যত্র-তত্র উপদ্রব ঘটতে থাকলে। সারা দেশ তখন জরুরি অবস্থার মধ্যে চলে যায়। কিন্তু আন্তর্জাতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে সারা পৃথিবীকে সেভাবে জব্দ করার না আছে ক্ষমতা, না আছে কোনো নিয়ম-নীতি। অগত্যা, কোনো এক বা একাধিক বলবান রাষ্ট্র যেভাবে চাইবে, সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে লড়াইও সংগঠিত হবে সেইভাবে। এই ব্যবস্থাকে তাই বাছাই করা সন্ত্রাসদমন (selective counter-terrorism) হিসেবে দেখা হচ্ছে।

সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে যেখানে যতরকমের আলোচনা চলছে, তাতে সবচেয়ে জোর পড়ছে এর সমসাময়িকতার ওপর। চাঞ্চল্য জাগানো ব্যাপার বলেই এরকম প্রবণতা। অবশ্য ইতিহাসের সোজা ও বাঁকা সড়ক ভ্রমণ করে এর অতীত ও বর্তমান নিয়ে

(সোভিয়েত সেনাবাহিনীর আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপের সময়) মার্কিন শিবিরের বিশেষ অনুগ্রহভাজন বিন্ লাদেনের নেতৃত্বাধীন অল্-কাঈদা নামক মৌলবাদী সংগঠনের ওপর।[৩৪]

১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসবাদী হানার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, একটি বিশেষ রাষ্ট্র যার সামরিক ও অর্থনৈতিক দাপট দুনিয়া জোড়া ঠিক তাকেই লক্ষ্য করে তারই প্রদর্শিত পদ্ধতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাকেই নাজেহাল করা। অল্-কাঈদা এখন একটি বহুজাতিক সুবিস্তৃত সংগঠন যার সদস্যরা পশ্চিমি সভ্যতার ঔদ্ধত্য ধ্বংস করতে কৃতসংকল্প। খোদ মার্কিন নগরী নিউ ইয়র্কে হানার অর্থ, অল্-কাঈদা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণা করে রাখল।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যাওয়ার পর থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও উঠে পড়ে লেগেছে প্রতিশোধমূলক সবরকম ব্যবস্থা নিতে। দেশের অভ্যন্তরে সুরক্ষা শতগুণ মজবুত করা, বিদেশি গমনাগমনের ওপর তীক্ষ্ণ নজর, National Commission on Terrorism-এর তত্ত্বাবধানে সন্ত্রাসবাদ সংক্রান্ত সারা দুনিয়া থেকে সমস্ত খুঁটিনাটি খবর সংগ্রহ, বৈদ্যুতিন নাশকতার প্রতিষেধক, জীবাস্ত্র (Cyber terrorism এবং biological weapons) ধ্বংসের সর্বাত্মক প্রয়াস এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠাগুলির সন্দেহজনক লেনদেন বন্ধ করা এর কিছু কিছু নিদর্শন। মার্কিন আইন বিভাগ সন্ত্রাসবাদের একটি সর্বাত্মক (comprehensive) সংজ্ঞাও স্থির করেছে।

"The term terrorism means premeditated politically motivated violence, perpetrated against non-combatant targets by subnational or clandestine agents."

এই সংজ্ঞা অনুসরণ করে বিদেশি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের (Foreign Terrorist Organisation) একটি বিশাল তালিকাও প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তালিকাভুক্ত সকলের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক আর্থিক ও অন্যান্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। যেহেতু আফগানিস্তানে তালিবান শাসকগোষ্ঠী বিন্ লাদেন ও অল্-কাঈদাকে আশ্রয় ও সহায়তা দিয়েছে, সেইহেতু মার্কিন যুদ্ধদপ্তরও সরাসরি সেদেশে এক বেপরোয়া বিধ্বংসী কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়ল। যেহেতু এক অভাবনীয় আন্তর্জাতিক বিভীষিকার বিরুদ্ধে এই লড়াই, সেহেতু আমেরিকার কূটনৈতিক প্ররোচনায় এই কাজে শামিল হল পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশ—যার মধ্যে পাকিস্তানসহ অনেক ইসলামি রাষ্ট্রও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পশ্চিম ইয়োরোপের দু' একটি অনিচ্ছুক দেশ—যেমন, ফ্রান্স, জার্মানিকে মানিয়ে নিতে মার্কিন কূটনীতিকে বেশ বেগ পেতে হয়। আবার পূর্ব ইয়োরোপের প্রাক্তন কম্যুনিস্ট-শাসনমুক্ত কয়েকটি দেশ (যেমন পোল্যান্ড)

স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সাড়া দিয়েছে। তদানীন্তন ভারত সরকারও শর্ত-সাপেক্ষে আগাম সহায়তার প্রতিশ্রুতিও দিয়ে ফেলেছিলেন, যদিও পরিবর্তে প্রাপ্তি বিশেষ কিছু হয়নি। মার্কিন সামরিক ও আর্থিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীল পাকিস্তানের বর্তমান নেতৃত্বে সেনাপ্রধান ও রাষ্ট্রপতি মুশারফের নির্দেশে এখন প্রকাশ্যে অল্-কাঈদা ও তালিবান সন্দেহভাজনদের শায়েস্তা করতে সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করেছে। কারণ সন্ত্রাস এখন পাকিস্তানের মধ্যেই মাথাচাড়া দিচ্ছে করাচি ও অন্যান্য নগরে। ঘটনা এই যে, মার্কিন নেতৃত্বে বিভিন্ন দেশ ও বিশ্বসংস্থা সরকারি ও বেসরকারি উভয়স্তরেই সন্ত্রাস-নিবারণের জন্য এখন প্রায় একজোট হয়ে কাজ করতে প্রস্তুত। এই জোটে অস্ট্রেলিয়ার অন্তর্ভুক্তি এই ধারণার অন্যতম সূচক বলে ধরা যায়।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, ঠিক কী অর্থে সন্ত্রাসবাদকে আন্তর্জাতিক আখ্যা দেওয়া যায়? শুধুমাত্র নানাদেশে নানা চেহারায় দেখা দিচ্ছে বলেই সেটা আন্তর্জাতিক চরিত্র পায় না, যদি না এদের মধ্যে কার্যক্রমের কোনো সমন্বয় অথবা সাধারণ কোনো লক্ষ্যবস্তু থাকে। তত্ত্বগতভাবে সেটা অসম্ভব না হলেও কার্যত দেখা যাচ্ছে একমাত্র অল্-কাঈদার দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও তার সাগরেদ রাষ্ট্রগুলিকে প্রধান অভিযুক্ত স্থির করা হয়েছে—এবং তার প্রধান কারণ মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘস্থায়ী অন্যায় অবিচার ও বিভেদ সৃষ্টির মূলে রয়েছে তারাই। এ অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে নিলেও কথা ওঠে, পৃথিবীর সর্বত্র পশ্চিমি পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের যে শোষণ চলেছে ও চলছে সেই প্রশ্নে অল্-কাঈদা জাতীয় সন্ত্রাসের অবস্থান আদৌ স্পষ্ট নয়। তাছাড়া আকস্মিক ও চোরাগোপ্তা সন্ত্রাসের পথে বিশ্বজমানা বদলের আশা দুরাশামাত্র। স্বতন্ত্র পরিচয়ে দাঁড়াবার মতো একটি বিশ্বব্যাপী আন্দোলনের আয়োজন এবং সেজন্য সাংগঠনিক শৃঙ্খলা আর সর্বোপরি তার একটি মতাদর্শগত ভিত্তি স্পষ্টতই এর মধ্যে অনুপস্থিত। এজন্যই সন্ত্রাসবিরোধী রণকৌশলবিদ্গণ ঘটমান সন্ত্রাসকে নীচু পর্দায় বাঁধা সংঘর্ষ (low-key conflict) আখ্যা দিয়েছেন।[৩৫] এক এক সমাজে এর চেহারা এক একরকম। অবশ্য সম্পূর্ণ যুদ্ধই (war) হোক আর প্রায়-যুদ্ধই (warlike) হোক, এর মধ্যে পার্থক্য রেখাটি ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে আসছে। রণপ্রযুক্তি ও রণকৌশলের যাবতীয় আধুনিক উদ্ভাবন এখন প্রায় মুক্ত কারবারের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ানোয়, সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের হাতে যে ধরনের মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র এসে গেছে, যে রকম দক্ষতায় তারা নিমেষে বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবনে, ব্যবসায়িক কর্মকেন্দ্রে অথবা যোগাযোগ ব্যবস্থায়—এমনকি গোপন সামরিক তথ্যও যেভাবে হাতানোর সুযোগ তারা পেয়ে যাচ্ছে, তার ফলে একে অন্য মাত্রার এক যুদ্ধের উদাহরণ বলা যেতে পারে। সন্ত্রাসবাদী জঙ্গিপনার সবচেয়ে মারাত্মক দিকটি হল এর অতর্কিত আক্রমণ ক্ষমতা। সেকারণেই চিহ্নিত বা ঘোষিত শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ আর সন্ত্রাসদমন

গবেষণাও যে শুরু হয়নি তা নয়। সমাজভূমির কোন্ গভীর অথবা অগভীর বিবরে সন্ত্রাসের শিকড় প্রোথিত আছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে সে বিষয়েও লেখালেখির বিরাম নেই। 'সভ্যতার সঙ্গে সভ্যতার অদমিত সংঘাত'—ঠাণ্ডা লড়াই থেমে যাওয়ার পর এভাবেই মাথাচাড়া দিচ্ছে এমন তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্যামুয়েল হান্টিংটন।[৩২] তাঁর ভাষায়—"In the post cold war world, the most important distinctions among peoples are not ideological, political or economic. In this new world the most pervasive, important and dangerous conflicts will not be between social classes, rich and poor, or other economically defined groups... In today's world ideology is not the centre of attraction... In post cold war period, states define their priorities in civilizational terms" এবং "civilization seems in many respects to be yielding to barbarism, generating the image of an unprecedented phenomenon, a global Dark Age."

অর্থাৎ আদর্শহীনতায় আক্রান্ত আজকের সমাজগুলিতে 'সভ্যতার বিরুদ্ধেই সভ্যতার সংঘাত'। সাময়িক কোনো অপকৌশল নয়, যেন সমূহ বিনাশের গভীর এক অভিসন্ধি এর পিছনে কার্যকর—যার থেকে জন্ম নিচ্ছে বিপজ্জনক এক মানসিকতা। হান্টিংটন যে বিপন্ন সভ্যতার কথা তুলেছেন, সেটি কিন্তু সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতার জন্য বিশেষ কোনো উৎকণ্ঠা নয়। পশ্চিমি জগতে গণতন্ত্র ও ধনতন্ত্র মিলে মিশে যে আধুনিক সভ্যতার জন্ম দিয়েছে, সেই সভ্যতার সঙ্গে যেন অন্যসব পুরনো সভ্যতা যাদের অস্তিত্ব আজও রয়ে গেছে, তাদের সংঘাতই যেন এর প্রধান বিবেচ্য বিষয়। আসল প্রশ্নটি কিন্তু এই তত্ত্বে আড়াল করা যায়নি। সেটি হল—পুরাতনের সঙ্গে আধুনিক সভ্যতার হঠাৎ এমন সাংঘাতিক দ্বন্দ্ব বেধে যাওয়ার কারণটি কী? একথা অস্বীকার করার নয় যে এই দ্বন্দ্ব আজকের নয়, এর উৎপত্তি আরও গভীরে—পশ্চিমি সভ্যতার পুঁজিবাদী প্রসারণশীলতায়; সাম্রাজ্যবাদে যার চরম লক্ষণ দেখা দিয়েছিল এবং এখনও যা ভিন্ন রূপে প্রাচ্যের বিভিন্ন অংশে নিজের আধিপত্য কায়েম রাখতে চায়। সেসব অংশে জাতীয় এবং আঞ্চলিক স্তরে নানা অসঙ্গতি (anomalies) সৃষ্টি হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের অপশাসনে। সেগুলি নির্মূল করে স্বাধীন মত ও পদ্ধতি অনুযায়ী বিকাশের পথ উন্মুক্ত করার ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে প্রবল প্রতিবন্ধকতা এবং তার মূলে রয়েছে ক্ষমতাসীন জাতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বিদেশি শক্তির হয় সংঘাত (যেমন, ইরাক ও ইরানে) অথবা যোগসাজস (যেমন সৌদি আরব, পাকিস্তান, আফগানিস্তানে)। ঠিক এই জায়গাগুলিতেই প্রবলতর পশ্চিমি শক্তিগুলি যে-কোনো অছিলায় সন্ত্রাসবাদ দমনের কাজে সশস্ত্র অভিযান চালানোর অলিখিত অধিকার

প্রয়োগ করে চলেছে। সেই কারণে বলা যায় সন্ত্রাস আন্তর্জাতিক মাত্রা পাচ্ছে তার কারণ বিশেষ বিশেষ এলাকায় বহিঃশক্তির কায়েমি স্বার্থরক্ষার জন্য হস্তক্ষেপ অবধারিত হয়ে উঠছে বলে। আজকের পশ্চিম এশিয়ায় একটি একটি করে দেশ তাই একদিকে মৌলবাদী সন্ত্রাস, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের মাশুল গুণে চলেছে।

সন্ত্রাসবাদ স্থানীয় গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারত এবং তার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হত স্থানীয় নেতৃত্বের সঙ্গে গৃহযুদ্ধের আঙ্গিকে (যেমন হয়ে চলেছে শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভারতবর্ষ অথবা রাশিয়ার চেচনিয়ায়)। কিন্তু সন্ত্রাস যেখানে চালানো যাচ্ছে কিংবা মদত পেয়ে চলেছে প্রতিবেশী দেশ থেকে (যেমন, কাশ্মীরে অথবা আজারবাইজান, তাজিকিস্তান বা আফগানিস্তানে) সেখানে দ্বিপাক্ষিক উত্তেজনা অনিবার্য। দেখা গেছে এইসব ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বা অঞ্চল-বহির্ভূত শক্তিগুলি সাধারণত, বিশেষ কোনো পক্ষকে প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন না জানিয়ে বিবাদ নিষ্পত্তির পরামর্শ দেয় অথবা গোটা ব্যাপারটি এড়িয়ে যায় (ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান এর উদাহরণ)। আসলে এক্ষেত্রে তৃতীয় পক্ষের অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলতে পারে।

বর্তমানে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের যে কাঠামো ও পদ্ধতি রয়েছে, তার মধ্যে সন্ত্রাসবাদের সুষ্ঠু মোকাবিলা সম্ভব নয় এই কারণে যে এই ধরনের সমস্যার জন্য কোনো অগ্রিম চিন্তাভাবনা বা প্রস্তুতি ছিল না। জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদেই এই ব্যাপারগুলি উঠেছে। কারণ, ধরে নেওয়া হচ্ছে, সন্ত্রাস এমন একটি ব্যাপার যা আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে। এবং সেই যুক্তিতে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিষেধমূল ব্যবস্থা গ্রহণও বিধিসম্মত। এক অর্থে সেটা ঠিক, কেননা সন্ত্রাস এখন পৃথিবীর নানা জায়গায় যুগপৎ মাথাচাড়া দিচ্ছে এবং বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের মধ্যে যোগসাজসও প্রমাণ হচ্ছে। শুধু তাই নয়, এদের কার্যকলাপে প্রাণহানি, সম্পদহানি ছাড়াও বিশ্বে অন্তঃরাষ্ট্র পরিবহন ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। সুতরাং সমবেত প্রয়াসে প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করা অবশ্যই অত্যন্ত জরুরি। আবার অন্য দিক থেকে দেখলে, সন্ত্রাস দমনে কার্যকরী পদক্ষেপ যা নেওয়া হচ্ছে তার ধরন ধারণটি যৌথ নিরাপত্তার আদলেই স্থির হচ্ছে। ফলে বৃহৎ পঞ্চক (big five) যেখানে মনে করছে সন্ত্রাস অসহনীয় হয়ে উঠছে আন্তর্জাতিক পদক্ষেপও অভিমুখী হচ্ছে সেই দিকে। তাছাড়া এক মেরুকৃত দুনিয়ায় পুলিশি কর্তব্য যেন স্থায়ীভাবে ন্যস্ত হয়েছে সামরিক শক্তিতে সবচেয়ে বলীয়ান যে রাষ্ট্র তারই ওপর। ফলত তারই অভিপ্রায় অনুসারে তারই নির্দেশে সামরিক অভিযান চালানো হচ্ছে সন্ত্রাসের ঘাঁটি বলে শনাক্ত কোনো কোনো দেশে। এর দ্বারা সন্ত্রাসবাদ নির্মূল অথবা দুর্বল হচ্ছে কিনা এখনও বলা যাচ্ছে না। তবে বৃহৎ পঞ্চকের প্রত্যেকেই (ফ্রান্স কিয়দংশে এখনও নিরাপদ) সন্ত্রাসবাদের দ্বারা কম-বেশি আক্রান্ত। সে-কারণে প্রধানত মার্কিন ও ব্রিটিশ উদ্যোগেই এখন

একটি সন্ত্রাস-বিরোধী মোর্চা গঠিত হয়েছে—ছোটো-বড়ো অনেক রাষ্ট্রই-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অথবা এর প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে। এই মোর্চা এখন পশ্চিম এশিয়াতেই অধিক সক্রিয়। কারণ ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর ১১ তারিখে (৯/১১ সংখ্যায় যা এখন চিহ্নিত) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরাসরি বিমানহানায় অভাবনীয় ধ্বংসলীলার পর কৃতকর্মের জন্য দায়ী অল্-কাঈদা নামক ইসলামি মৌলবাদী সংগঠনের সঙ্গে সংশ্রব আছে ঐ অঞ্চলেরই বেশ কয়েকটি দেশের। সমান্তরাল আর একটি প্রয়াস দেখা দিয়েছে এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় যা সাংহাই উদ্যোগ[৩৩] নামে পরিচিত। এর বিস্তার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব থেকে মধ্য এশিয়া জুড়ে। রাশিয়া ও চীনের ভূমিকা এ ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং লক্ষণীয় এই যে, সন্ত্রাসবিরোধী এই প্রয়াসে সারি দিয়ে যুক্ত হয়েছে মঙ্গোলিয়া, কাজাকাস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, কিরঘিজস্তান। প্রধানত মুসলমান-অধ্যুষিত এই এলাকায় প্রাক্তন সোভিয়েত অঙ্গ-রাজ্যগুলির মৌলবাদী নাশকতা সম্বন্ধে উদ্বেগ খুবই শঙ্কাজনক।

এই তথ্যগুলি একত্র করলে সন্ত্রাসের একটা মানচিত্র ফুটে ওঠে। আপাতত দৃষ্টিগোচর হয়েছে যেসব সন্ত্রাসমূলক তৎপরতা, সেগুলি কয়েকটি বিশেষ বলয়ে আবদ্ধ—যার একটি পশ্চিম এশিয়া থেকে দক্ষিণ এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্যগুলি অতটা স্পষ্ট নয়। কিন্তু বারে বারে সংঘর্ষ আর উপদ্রবে এদের অস্তিত্ব চাপা থাকছে না। এলাকা ধরে বিশ্লেষণ করলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে দীর্ঘকালব্যাপী মানুষের সমাজে যেখানে বড়ো মাপের কিছু সমস্যা অমীমাংসিত থেকে গেছে সেখানেই সন্ত্রাসের জন্ম। ন্যায়সঙ্গত সমাধানে অযথা বিলম্ব কিংবা নিশ্চেষ্টতা কিছু মানুষকে অত্যন্ত চরমপন্থী করে তোলে। সর্বত্রই বৈধ রাজনৈতিক ক্ষোভ আতঙ্কবাদী তৎপরতার উপজীব্য। পশ্চিম এশিয়ায় প্যালেস্তিনীয় আরবদের নিজভূমে পরবাসী অবস্থা এবং মাঝে মাঝে মার্কিন শান্তি প্রয়াস সত্ত্বেও আরব-ইজরেয়লী সংঘর্ষের কোনো উপশম না হওয়ায় জন্ম হয়েছে ইন্তেফাদা জাতীয় আন্দোলন ও 'হামাস' (Hamas) ধরনের চরমপন্থী সংগঠনের।

সুতরাং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বৃহত্তর প্রেক্ষিতে সন্ত্রাসবাদকে যখন সংস্থাপন করা হয়, তখন স্বীকার করতেই হয় যে, সন্ত্রাসবাদের মূলে রয়েছে যেসব অসন্তোষ আর অসঙ্গতি, তার যথাযোগ্য সমাধান দেওয়া কোনো আন্তর্জাতিক সংগঠনেরই ক্ষমতাধীন নয়। এজন্য প্রয়োজন নিরপেক্ষ কূটনৈতিক উদ্যোগ যা কার্যকর হতে পারে তখনই যখন সংশ্লিষ্ট সমস্ত স্বার্থগোষ্ঠী (stake-holders)-কে একত্র করে আলোচনা শুরু হয়। অথচ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ শুধুমাত্র রাষ্ট্রগুলির সঙ্গেই সম্পর্ক রাখে। রাষ্ট্র-বিরোধী সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সঙ্গে যদি আলোচনায় বসতেই হয়, তবে সেকাজও করতে হবে সংশ্লিষ্ট সরকারকেই। তামিল উগ্রপন্থীদের সঙ্গে শ্রীলঙ্কা সরকারের

মাঝে মাঝে যে স্বল্পস্থায়ী শান্তি-চুক্তি (truce) হচ্ছে, সেখানে দেখা যাচ্ছে একটি নিরপেক্ষ তৃতীয় রাষ্ট্র নরওয়ের মধ্যস্থতা খুবই সময়োচিত এবং ফলপ্রসূ হয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক স্তরে সক্রিয় সন্ত্রাসবাদের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক কূটনীতির প্রবেশই প্রায় নিষিদ্ধ। মনে হয় বৃহৎ শক্তিগুলিকে সরিয়ে রেখে নিরপেক্ষ মাঝারি শক্তিসমূহের সহায়তা নিলে হয়তো এ ব্যাপারে কিছু অগ্রগতি হতে পারে।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ

কোনো একটি রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল (যেমন হয়েছিল ফরাসি বিপ্লবে) ; অথবা রাষ্ট্র-ভুক্ত কোনো এলাকার বিচ্ছিন্নতা কায়েম রাখা, যেমন হয়েছে উত্তর আয়ার্ল্যান্ডে ; কিংবা অবৈধ চোরাচালান চালু রাখতে একটানা অথবা আকস্মিক হামলাবাজি—এ জাতীয় কোনো একটি কার্যক্রম প্রকৃত অর্থে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে না। আবার সন্ত্রাসবাদের কোনো সর্বসম্মত সংজ্ঞা যে দেওয়া যায়, তাও নয়। বলা হয় হিংসার ব্যবহার কিংবা হিংসা প্রয়োগের হুমকির মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভীতি বা ত্রাস সঞ্চার করার প্রয়াসই হল সন্ত্রাসবাদ। এর লক্ষ্য হতে পারে কোনো জাতিগত বা ধর্মীয় সম্প্রদায়, সরকার বা রাজনৈতিক দল বা বেসরকারি কোনো সংগঠন, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি। এই সংজ্ঞার প্রধান সমস্যা হল এর মধ্যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস অর্থাৎ রাষ্ট্র নির্দেশিত সন্ত্রাস অন্তর্ভুক্ত হয় না। আবার স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের দ্বারা পরিবর্তনের চেষ্টার মধ্যেও সন্ত্রাসমূলক পদ্ধতি ব্যবহার করতে দেখা গেছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে জাতীয়তাবাদ ও পরিবর্তনের মতাদর্শ বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ভিত্তি হিসেবে গৃহীত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে মধ্যপ্রাচ্যে আরব-ইজরেয়ল দ্বন্দ্বের মধ্যে সন্ত্রাসবাদের প্রথম আন্তর্জাতিক মাত্রাটি প্রকাশ পায় এবং ষাটের দশক থেকে ক্রমশই তা ব্যাপক চেহারা নিতে থাকে। সত্তর ও আশির দশকে অল্ ফাতাহ্, ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর ও হামাস প্রভৃতি সংগঠন এর পুরোধা হিসেবে কাজ করতে থাকে। ১৯৭২ সালে মিউনিখ অলিম্পিক গেম্স থেকে ১১ জন ইজরেয়লী ক্রীড়াকুশলীর অপহরণ ও হত্যা এদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এরপর ১৯৮৩ সালে বেইরুট ও লেবাননে মার্কিন দূতাবাসে সন্ত্রাসী হানা, ১৯৯৬ সালে সৌদি আরবে ট্রাক বোমা বিস্ফোরণে মার্কিন সেনাদের মৃত্যু, ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের সন্ত্রাসবাদ আন্তর্জাতিক প্রসিদ্ধি বা কুখ্যাতি অর্জন করে।

এই কার্যকলাপেরই চূড়ান্ত পরিণতি ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যখন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত পর পর বিমানহানায় চোখের ওপর ধূলিসাৎ হয় নিউ ইয়র্কের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রের আকাশচুম্বী দুই ইমারৎ। দায়িত্ব বর্তেছে আরব রাজবংশজাত, এককালে

সন্ত্রাসবাদ (Terrorism)

মানবসভ্যতার বর্তমান কালপর্ব একদিকে যেমন আশাতীত উন্নয়ন এবং জাতিতে-জাতিতে সংঘর্ষের পাশাপাশি সহযোগের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে চলেছে, অন্যদিকে আবার মানুষেরই সৃষ্ট নাশকতায় সৃষ্টি হচ্ছে আতঙ্কের এক স্থায়ী বাতাবরণ। সন্ত্রাসবাদের মারাত্মক আঘাতে বিপর্যস্ত হচ্ছে একাধিক জনসমাজ। কোথাও কোথাও বিস্তীর্ণ এলাকা এখন উপদ্রুত বলে চিহ্নিত। অথচ ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অবসানের পর আশা করা গিয়েছিল সংঘাতের স্থান নেবে শান্তি ও সুস্থিতি। তার বদলে সন্ত্রাস এখন আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় উভয় স্তরেই একটি জটিল সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

সন্ত্রাস ও আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা

সন্ত্রাস নানা দিক থেকে বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে বিচলিত করে তুলেছে।

১. নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে সংগঠিত জাতি-রাষ্ট্রের বিদ্যমান কাঠামোকে ভঙ্গুর প্রমাণ করা এবং জাতীয় শাসনব্যবস্থার প্রচলিত বিধানের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করা। এর নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অনিশ্চয়তা এবং অস্থিরতায় আক্রান্ত রইবে দুনিয়ার বেশ কয়েকটি এলাকা। তাদের স্বাভাবিক বিদেশনীতিও সেই অনুপাতে বিঘ্নিত হবে।

২. আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ক্ষমতাবান রাষ্ট্রগুলি প্রভাবের ক্ষেত্র (spheres of influence) নির্মাণে যতটা নিরাপদ সাফল্য আশা করে এসেছে, সন্ত্রাসবাদের অভ্যুত্থানে তা আর নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবার নয়।

৩. আঞ্চলিক সমস্যাগুলি যখন আন্তর্জাতিক স্তরে কোনো সুষ্ঠু মীমাংসা পায় না, তখন সন্ত্রাস তাতে অন্য এক মাত্রা সংযোজন করে। হয় সেগুলির স্থানীয়ভাবে সমাধান করিয়ে নেওয়া, নয় আন্তর্জাতিক প্রয়াসকে সফল করার জন্য বাইরে থেকে আসা ব্যাপকতর জুলুম সহ্য করা। নচেৎ অভ্যুত্থান, দমন এবং আবার অভ্যুত্থান এইভাবে চক্রাকারে অশান্তি চলতেই থাকে।

৪. সন্ত্রাসবাদের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ভরকেন্দ্র যতই টলে উঠবে, বৃহৎ শক্তিগুলি ততই পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসতে থাকবে। তাদের পারস্পরিক দ্বেষ এবং বিবাদকে উপেক্ষা করে সমবেত প্রয়াসে সন্ত্রাসকে প্রতিহত করার কাজটিকে তারা অগ্রাধিকার দেবে। অন্যভাবে দেখলে, বৃহৎ শক্তির আধিপত্যের পক্ষে একটা অতিরিক্ত সওয়াল করার অজুহাত এইভাবে তৈরি হয়ে যায় এবং আতঙ্কগ্রস্ত ক্ষুদ্র শক্তিগুলি স্বভাবতই বৃহৎ শক্তিসমূহের চিন্তায় প্রভাবিত হয়ে তাদের কাছেই সমর্পিত হয় সুরক্ষার আশায়।

৫. বিশ্ব-রাজনীতিকে এখন আর বিশ্ব-অর্থনীতি থেকে আলাদা করে দেখার উপায় নেই। অর্থনৈতিক শক্তিই এখন ক্ষমতার মানদণ্ড এবং অর্থনৈতিক প্রভুত্বকেই নয়া সাম্রাজ্যবাদ হিসেবে গণ্য করা হয়। এই প্রেক্ষিতে, সন্ত্রাসজাত হানাহানি ক্রমপ্রকাশমান বিশ্ব-অর্থনীতির স্বাভাবিক ক্রিয়াকে ব্যাহত করে। মুনাফা অর্জনের যে হিসেব-নিকেশ অনুসরণ করে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের দিক নির্দিষ্ট হয়ে থাকে—কোনো বিশেষ এলাকায় সন্ত্রাসবাদী উৎপাত দীর্ঘস্থায়ী হলে অথবা কোনো কোনো বৃহৎ শক্তি বিশেষভাবে সন্ত্রাসবাদের লক্ষ্যস্থল বলে ঘোষিত হয়ে থাকলে, বিশ্ব অর্থনীতির স্রোত সেখান থেকে ঘুরে যেতে থাকবে যাতে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ব্যাপক ক্ষতি এড়ানো যায়।

৬. সন্ত্রাসবাদ কোনো একটি দেশ বা অঞ্চল থেকে যদি অন্য নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং বর্তমান যুগে সেটাই তার সমধিক গুরুত্বের অন্যতম কারণ—তাহলে সন্ত্রাসবাদকেও একটি স্বতন্ত্র আন্তর্জাতিক শক্তি হিসেবে গণ্য করতে হয়। বিদ্যমান সুস্থিতির বিরুদ্ধে যেহেতু তার আক্রমণ, সেইহেতু তাকে রুখতে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলি, বিশেষ করে UNO, তৎপর হতে বাধ্য। এখানে যৌথ নিরাপত্তার ধারণাটিই বদলে যাচ্ছে; কারণ কোনো একটি আগ্রাসী দেশের বিরুদ্ধে নয়, অনির্দিষ্ট এবং সঞ্চরণশীল এক অজানা শত্রুর বিরুদ্ধে সমবেত আঘাত হানার প্রস্তুতি চলবে। সেজন্য বেছে নেওয়া হবে সেইসব দেশকে যেগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়ার ব্যাপারে অভিযুক্ত। কিন্তু বৃহৎ শক্তির স্বার্থে এবং নির্দেশে পরিচালিত সন্ত্রাস নিবারক ব্যবস্থা সর্বত্র সমানভাবে প্রযুক্ত হতে পারে না। কারণ, দুনিয়ার যত্র-তত্র যখন তখন সন্ত্রাসদমনের ক্ষমতা যদি আন্তর্জাতিক সংগঠনের হাতে থাকত, তাহলে সে সংগঠন প্রায় বিশ্বরাষ্ট্রের সমতুল্য শক্তিধর একটি সত্তা হিসেবে পরিগণিত হত—যেমন হয়ে থাকে জাতি-রাষ্ট্রের ভিতরে যত্র-তত্র উপদ্রব ঘটতে থাকলে। সারা দেশ তখন জরুরি অবস্থার মধ্যে চলে যায়। কিন্তু আন্তর্জাতিক সংগঠনের ক্ষেত্রে সারা পৃথিবীকে সেভাবে জব্দ করার না আছে ক্ষমতা, না আছে কোনো নিয়ম-নীতি। অগত্যা, কোনো এক বা একাধিক বলবান রাষ্ট্র যেভাবে চাইবে, সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে লড়াইও সংগঠিত হবে সেইভাবে। এই ব্যবস্থাকে তাই বাছাই করা সন্ত্রাসদমন (selective counter-terrorism) হিসেবে দেখা হচ্ছে।

সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে যেখানে যতরকমের আলোচনা চলছে, তাতে সবচেয়ে জোর পড়ছে এর সমসাময়িকতার ওপর। চাঞ্চল্য জাগানো ব্যাপার বলেই এরকম প্রবণতা। অবশ্য ইতিহাসের সোজা ও বাঁকা সড়ক ভ্রমণ করে এর অতীত ও বর্তমান নিয়ে